e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৭, সংখ্যা: ৮ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | নভেম্বর ২০১৬

জানা অজানা

বার্তার অপেক্ষায়

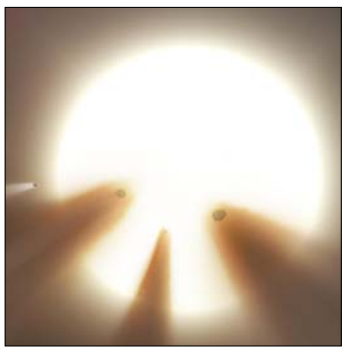

সুদূর আকাশে একটা তারার দিকে তাক করা হয়েছে বিরাট এক রেডিও টেলিস্কোপ। তারাটির নাম টোবিস স্টার। তারাটির অদ্ভুৎ আলো মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে। এটি যেন এক বিশেষ তারা, অনেকের থেকে আলাদা এর আলোর খেলা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এর উজ্জ্বলতা কখনও কখনও বেশ কমে যায় – প্রায় ২২% হ্রাস পায় তার আলো। আবার বেড়ে যায় এক সময়। অথচ তার আলো কমে যাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময়ও নেই। অর্থাৎ কোনও এক মহাজাগতিক বস্তু তার বাঁধাধরা কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে তারাটিকে আড়াল করছে এমন নয়। তার আলো কমে যায় হঠাৎ হঠাৎ, যেন কেউ বা কারা নিজেদের ইচ্ছে মত তারাটির সামনে বিশাল এক দেওয়াল তুলে দেয় থেকে থেকে। যার ফলে তার রশ্মির কিছুটা আটকে যায়। কেউ কেউ বলেছেন হয়তো বা এক রাশ ধূমকেতু তারাটিকে আড়াল করে উড়ে যায়, আর সেই সময় গ্রহণ লাগার মতোই কমে যায় তার আলো। কিন্তু কোনও নিয়ম মেনে তো তা ঘটে না। ধূমকেতুর ঝাঁক কেন সময় অসময়ে উড়ে যায় তার সামনে দিয়ে? সদুত্তর মেলে নি। তাহলে কি কোনও অতিবুদ্ধিমান প্রাণী সত্যিই কোনও অতিকায় বস্তু দিয়ে মাঝে মাঝে তারাটিকে কোনও এক বিশেষ কারণে আড়াল

এবার ২ পাতায়

একটি পাখির জন্য সৃষ্টি হল অরণ্য

ল্যাজঝোলা কালো পাখিটির বাসস্থান ফিরিয়ে দিল ব্রেজিলের হাজার হাজার শিশু

হ্যাঁ শুধু তার জন্যই ব্রেজিলে তৈরি হয়ে গেল এক বিশাল অরণ্য। তার জন্যই ব্রেজিলের হাজার হাজার শিশু গড়ে তুলল 'ট্রি ক্লাব', সে ফোরব্স ব্ল্যাকবার্ড (ছবি)। লেজঝোলা ছোটখাটো কালো, অনেকটা যেন আমাদের কোকিলের মতো দেখতে। ব্রেজিলে সে 'আনুমারা' নামেও পরিচিত। পূর্ব ব্রেজিলে বায়োলজিকাল পার্ক পেড্রা তালহাদা'য় গিয়ে পাখি-বিজ্ঞান'র ছাত্রী, সুইস অনিতা স্টুডার (ছবি) আনুমারার প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু জানতে পারেন, নির্বিচার অরণ্য ধ্বংসের ফলে আনুমারা প্রায় বিলুপ্তির পথে। এবং এক দশকের মধ্যেই ওই অরণ্যও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই 'জানা'ই অনিতার জীবন বদলে দিল। অরণ্য বাঁচানোর মন্ত্রে যেন নিজেই নিজেকে দীক্ষিত করলেন অনিতা। গড়ে উঠল বনভূমি।

নাহ, অবশ্যই কোনও যাদুদন্ডের সাহায্যে চোখের নিমেষে সেই বন তৈরি হয়ে যায়নি। লেগেছে তিন তিনটে দশক। 'আসলে লোকেরা যতই বলত - তুমি কিছুতেই বন বাঁচাতে পারবে না ততই যেন আমার সেটা করার জন্য জেদ চেপে যেত। তাছাড়া যখন জানতে পারলাম যে, ওই পাখিরাই অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হল একজন তরুণ বিজ্ঞানী হিসেবে তাহলে তাদের নিয়ে কী ভাবে আমি গবেষণা চালাব? কারণ সেই সময় ওই ব্ল্যাকবার্ডদের সংখ্যা অবশিষ্ট ছিল মাত্রই কয়েক'শ যাদের বাঁচানো তো অত্যন্ত জরুরি'। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'এ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন রোলেক্স লরিয়েট অনিতা স্টুডার।

স্টুডার বুঝেছিলেন দ্রুত কাজ শুরু করা দরকার। তিনি পেড্রা তালহাদার জন্য বীজ পুঁতে গাছের চারা তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। তবে বন তৈরি করা তো আর একার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু কারা তাঁর সঙ্গে হাত মেলালো? সেখানকার কুইব্রাঙ্গুলো গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। তারা 'ট্রি ক্লাব' গড়ে তুলল। এবং ট্রি ক্লাব'র ওই খুদে সদস্যরাই সেনাপতি স্টুডারের তত্ত্বাবধানে অরণ্য গড়ে তোলার লড়াইয়ে ক্রমেই সৈনিক হয়ে উঠল। তবে লোক জনদের বুঝিয়ে তাঁদের জমিতে গাছ লাগানো প্রথম প্রথম অবশ্য খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কারণ এতে তাঁদের আয় কমে যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু একবার বন্যা হল। আর তাতেই সেখানকার ১৫০' রও বেশি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। তখন বাসিন্দারা বুঝতে পারেন, বন কেটে ফেলার জন্যই ভূমি ক্ষয়, আর তাতেই ওই বিপত্তি। এবং ওই বন্যাই যেন গ্রামবাসীদের বোঝালো যে অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা কত।

এরপর গাছ লাগানোর কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গেল। এবং ব্রেজিল সরকারও স্টুডারের এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়ালো। পেড্রা তালহাদার ১১,০০০ একর জমিতে কোনও রকম বানিজ্যিকহারে গাছ কাটা, চাষাবাদ, গবাদি পশু চরানো - সবই নিষিদ্ধ করে তাকে সংরক্ষিত করা হল ১৯৮৯ সালে। স্টুডারের জীবনে, 'সেই দিনটিই ছিল সব থেকে মহত্ত্বপূর্ণ'।

জোর কদমে চলতে থাকল নার্সারি তৈরির কাজ। ব্রেজিলের

এবার ২ পাতায়

দু'ঘন্টা না খেলেই প্রাণ যায়

মাত্র ২ ঘন্টা খেতে না পেলেই সে মরে যাবে। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম হলেও বিশ্বের ক্ষুধার্ততম পাখি হামিংবার্ড। শুধু বেঁচে থাকার জন্যই প্রতিদিন এক ফ্রিজ ভর্তি খাবারের সম পরিমান খাবার তাকে খেতে হয়, যা এক জন মানুষের পক্ষে খাওয়া বোধহয় সম্ভবই নয়। কিন্তু সবচেয়ে খুদে, সবচেয়ে হাল্কা পাখিটির

এমন সব সময় খাইখাই ভাব কেন? আসলে তারা যে খুব দ্রুত পাখা ঝাপটায়। সেকেন্ডে ৫০- ৮০ বার। তাদের হার্টবিটও মিনিটে ৫০০-১২০০ বার। এবং সারাক্ষণ পাখা ঝাপটানোর জন্যই তার সমস্ত এনার্জি ক্ষয় হয়ে যায়।

জঙ্গল সৃষ্টি

১ পাতা থেকে

১৯ গ্রামে গাছের নার্সারির জন্য ১০,০০০ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিযুক্ত হল। পরে স্টুডারের এই উদ্যোগ নিয়েই একটি ইটালিয়ান তথ্যচিত্রও তৈরি হয় 'মাদার ফরেস্ট অ্যান্ড স্ট্রিট চিলড্রেন' নামে। স্টুডার জানিয়েছেন যে, ৩০ বছর ধরে গোটা ব্রেজিল জুড়ে ৬০ লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। তার সঙ্গে ১৫ কিমি গ্রিন করিডরও তৈরি করা হয়েছে, যা 'সুইস ফরেস্ট' নামে আজ পরিচিত। শুধু তাই নয়, বনে বনে ব্ল্যাকবার্ড বা আনুমারা'দের সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এবং অনিতা যে ওই আনুমারাদের বাসস্থানই কেবল ফিরিয়ে দিলেন তাই নয়, পরোক্ষে আরও অসংখ্য জীব-জন্তু, পোকা-মাকড়, উদ্ভিদ তথা প্রাণের আবাসস্থলও গড়ে দিলেন। হয়তো নিজের অজান্তেই আরও কোনও কোনও প্রাণের ক্রমাবলুপ্তির পথও রোধ করে দাঁড়ালেন তিনি। সন্দেহ নেই বন বাঁচানোর ধর্ম যুদ্ধে অনিতা স্টুডার এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। যে যুদ্ধের বিজয়কেতন বয়ে নিয়ে চলেছে ওই হাজার হাজার শিশু সৈনিক। gvjex

বার্তার অপেক্ষায়

১ পাতা থেকে

করে? বেশিরভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা একশো কোটিতে এক। তবুও সেই ক্ষীণতম সম্ভাবনাটাও যাচাই করে নিতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা। রেডিও টেলিস্কোপ

স্টিফেন হকিং

তাই তাক করা হয়েছে টোবিস স্টারের দিকে, যদি কোনও সংকেত আসে দূরের সেই তারা থেকে। আর এই খোঁজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। কারণ সব সম্ভাবনাই যাচাই করার পক্ষপাতি তিনি, তা সে সম্ভাবনা যতই ক্ষীণ হোক না কেন। m~ ,:

মাত্র ৪০ বছরে বন্যপ্রাণী কমেছে ৫৮%

মাত্র ৪০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ৫৮ শতাংশ কমে গেছে। লন্ডনের জুলজিকাল সোসাইটি এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড তাদের রিপোর্টে বলেছে ১৯৭০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে এই বিলুপ্তি ঘটেছে। আরও বলা হয়েছে যে, এই হারে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তিন ভাগের দু ভাগ মেরুদন্ডি প্রাণী নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে জলের প্রাণীরা – যারা হ্রদ, নদী, সমুদ্রে থাকে – তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এবং এও বলা হয়েছে মানুষের কার্যকলাপ, বাসস্থান হরণ, বন্যপ্রাণীর ব্যবসা, দূষণ ও আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে প্রাণীজগতে এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। রিপোর্ট থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপই পৃথিবীর আর সব প্রাণীদের ধ্বংসের কারণ।

বিপন্নদের তালিকায় সবচেয়ে ওপরে আছে মিষ্টি জলের প্রাণীরা। পৃথিবীর মিষ্টি জল যে ভাবে দূষিত হচ্ছে, ওই সম্পদ যে ভাবে অপচয় করা হচ্ছে, আর দু পা অন্তর একটি করে বাঁধ নির্মাণ করে নদীগুলিকে যে ভাবে বেঁধে ফেলা হচ্ছে, তার ফলে জলের প্রাণীরা এখন এক গভীর সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে হাঙরের সংখ্যা নাকি কমে যাচ্ছে খুব দ্রুত। স্থলের প্রাণীদের মধ্যে হাতির সংখ্যাও খুব বেশি কমছে, মূলতঃ চোরা শিকারীদের কারণে।

> বিপন্নদের তালিকায় সবচেয়ে ওপরে আছে মিষ্টি জলের প্রাণীরা

বলা হচ্ছে যে ভাবে এখন সব কিছু চলছে আগামী দিনেও যদি তা বহাল থাকে, তাহলে এই দশকের শেষে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ১৯৭০ সালের তুলনায় ৬৭ শতাংশ কমে যাবে।

পোকা খেয়ে সুস্থ, সবল থাকা যায় কি?

কথায় বলে ছাগলে কী না খায়। ছাগল সম্পর্কে যাঁরা এমন উক্তি করে থাকেন তাঁদের বিচার বিবেচনা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। কারণ ছাগল আদতে বেশি কিছু খায় না। পৃথিবীতে সত্যিই যদি কোন সর্বভুখ প্রাণী থেকে থাকে তা হল মানুষ। মানুষে কী না খায়! চাল, ডাল ঘাসপাতা, ফলমূল তো খায়ই, তা ছাড়া আরও কত কী – গরু, ছাগল, ভেড়া, মোষ, পাখি, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, হাতি, ঘোঁড়া, শেয়াল, কুকুর, কুমির, মাছ, হাঙর, অক্টোপাস, খরগোশ, বনবেড়াল, বাঁদর, গোরিলা...এমনকী মানুষও (এক সময় নানা জনগোষ্ঠির মধ্যে মানুষের মাংস খাওয়ার চল থাকার কথা জানা যায়)। অথচ বদনাম হয় ছাগলের।

আবার পৃথিবীর জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ এত বিপুল পরিমাণ খায়, আর খাবার অপচয় করে যে, এ গ্রহের খাদ্যভান্ডারই নিঃশেষ করে দিতে বসেছে তারা। এবং সমুদ্রে অনেক প্রজাতির মাছের সংখ্যা ভীষণ কমে গেছে ধনী দেশগুলির মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে।

এখন আবার তাদের নজর পড়েছে পোকাদের ওপর। গবেষণা করে দেখা হচ্ছে কোন পোকা থেকে কতটা প্রোটিন আর আয়রন পাওয়া যেতে পারে। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির 'জারনাল অফ এগ্রিকালচারাল ফুড অ্যান্ড কেমিস্ট্রি' থেকে জানা গেছে এ কথা। বলা হয়েছে পৃথিবীতে এখন যে পরিমাণ গোমাংসের প্রয়োজন তা উৎপাদন করতে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া অতিমাত্রায় মাংস খাওয়া ভাল নয় বলেও মনে করা হচ্ছে এখন। তাই খাদ্য হিসেবে কোন পোকা উপাদেও হবে তাই নিয়ে চলছে গবেষণা।

পৃথিবীর নানা জনজাতির মধ্যে পোকা খাওয়ার চল আছে। গবেষণা থেকে জানা গেছে প্রায় ১,৯০০ প্রজাতির পোকা নানা ভাবে খেয়ে থাকে নানা দেশের মানুষ। চিনে আরসোলা খাওয়ার চল আছে। বলা হয় আরসোলা খেলে পাওয়া যায় অনেকটা প্রোটিন আর সারান যায় নানা অসুখ। ভারতের উত্তর-পূর্বে শুঁয়োপেকা খাওয়া হয়। মধ্যভারতের আদিবাসিরা খান পিঁপড়ে আর পিঁপড়ের ডিম, যা সত্যিই বেশ সুস্বাদু।

কিন্তু সমস্যা হল এই যে পোকারা ইতিমধ্যেই নানা ভাবে আক্রান্ত। পেস্টিসাইডের দৌলতে অনেক প্রজাতিই বিলুপ্তির মুখে। তার ওপর ধনী দেশের মানুষরাও যদি পোকা খাওয়ায় মেতে ওঠে, তাহলে পতঙ্গের দল অচিরেই নিঃশেষ হওয়ার সম্বাবনা দেখা দেবে।

দাঁতালো হরিণ

ঘন চকোলেট রঙের খুবই বিরল, ছোট্ট হরিণ প্রজাতির পুরুষদের ড্রাকুলার মতো মুখের দুপাশে দুটি দাঁত থাকে। আর কপালে থাকে কালচে বাদামি ঝুঁটির মতো একগুচ্ছ লোম। ভোর আর সন্ধ্যাতেই তারা ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে জোড়ায় থাকলেও সাধারণত তারা একাকীই থাকে। এই হরিণদের বিচরণ ক্ষেত্র দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব চিন, পূর্ব তিব্বত ও মায়ানমারের উত্তরাঞ্চল। তাদের ৯-১০ হাজার ফিট থেকে ১৪-১৫ হাজার ফিট উঁচুতে কদাচিৎ দেখা মেলে। মনে করা হয় এই দাঁতালো খুদে হরিণরা বিপন্নের মাপকাঠি প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। কারণ প্রতি বছর প্রায় এক লাখ এই হরিণ শিকার করে স্থানীয় বাসিন্দারা। উচ্চতায় দুই - আড়াই ফুট এই ছোট্ট হরিণের ওজন হয় ১৭-৩০ কেজি। প্রকৃতিতে তারা বাঁচে ১০-১২ বছর।

অ্যামাজনের বেশি প্রাণীই থাকে গাছের মগডালে

জেনে রাখা ভাল

পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রান্তীয় বর্ষারণ্য অ্যামাজন, অ্যামাজনিয়া নামেও পরিচিত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা এই আদিম অরণ্যের সমস্ত প্রাণই একে অপরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এই অরণ্য সম্পর্কে জানা যায় যে -

● আলোর মাত্র ২% ঘন জঙ্গল ভেদ করে মাটি ছুঁতে পারে। অ্যামাজনের বর্ষারণ্যের ৮০% প্রাণীই তাই বড় বড় গাছের একেবারে মাথায় বাস করে। গভীর অরণ্যের মাটিতে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না বলে বনভূমি অন্ধকার ও ভিজে ভিজে থাকে। অন্যদিকে বনে গাছের মাথাগুলো থাকে শুকনো ও গরম যা তাদের বসবাসের বেশ উপযুক্ত।

● অ্যামাজন অরণ্যের আর্দ্রতা খুব বেশি। সেখানে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রায় খুব তফাৎ হয়।

● এই অরণ্য ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এবং এখানে ৪০০-৫০০ আদিম আমেরিকান উপজাতি মানুষের বাস। যাদের মধ্যে অন্তত ৫০ উপজাতিআছে, মনে করা হয় যাদের সঙ্গে বহিঃ পৃথিবীর

কোনও সংযোগ ঘটেনি কখনও।

● জীববৈচিত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই অ্যামাজনে ১৩০০ প্রজাতির পাখি, ৪০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪৩০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩০০০ প্রজাতির মাছ ও ২০ লক্ষ ৫০ প্রজাতির পোকামাকড় আছে।

● অ্যামাজনে pestalotiopsis microspora নামে এক ধরনের ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের বাস, যারা প্লাস্টিক খেয়ে ফেলে।

● একটা গোটা দেশে যত রকমের পিঁপড়ে দেখা যায়, অ্যামাজন অরণ্যে কেবল একটি মাত্র গাছেই তার থেকে বেশি প্রজাতির পিঁপড়ে দেখা যায়।

● পৃথিবীর মোট উৎপাদিত অক্সিজেনের ২০%ই জোগায় এই বর্ষারণ্য। এমনকী সুদূর আমেরিকায় বর্ষা কেমন হবে অ্যামাজনের এই বর্ষারণ্য তাও নিয়ন্ত্রণ করে ।

● ক্যানসার প্রতিরোধী গুণাগুণ আছে এমন সব বনৌষধির ৭০%'রই আবাসস্থল এই অরণ্যে।

● বছরে একটি করে প্রজাতির বিলুপ্তি স্বাভাবিক ভাবেই হয়। কিন্তু বন ধ্বংসের ফলে এখানে সেটা ৩-৪ গুণ বেশি হচ্ছে।

● অরণ্য ধ্বংস বা গাছ কেটে ফেলাই এখন অ্যামাজন অরণ্যের কাছে সবথেকে বড় হুমকি।

● গত ৪০ বছরে অ্যামাজনের ২০% অরণ্য কেটে ফেলা হয়েছে।

● পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি আর ৩ ডিগ্রি বাড়ে তাহলে অ্যামাজনের ৭৫%ই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এখন বারো মাসই পেটপুজো

মাছভাত, বিরিয়ানি, চাও, চপ, মোগলাই

চিলিচিকেন, ফিশফ্রাই, রোল আরও যা যা চাই

খাই খাই রেস্টুরেন্ট

৩৪১/২ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, শিবপুর, হাওড়া

(নবান্ন বাস টার্মিনাসের কাছে)

ফোন: ৮৪৪৪০১২১৭৭/৮০১৩৭৩৩৬৫০

দূষণ-পীড়িত মেঘ ভীষণ রোষে ফুঁসছে

মেঘের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। এক সময় আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখলে মন আনন্দে নেচে উঠত। এখন মেঘ জমতে দেখলে মনের কোণে আশঙ্কা দানা বাঁধে। কী থেকে কী হয় কেউ বলতে পারে না। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানি প্রাণ নিতে পারে মানুষের। মেঘের সঙ্গে ধেয়ে আসা ঝোড়ো হাওয়া গাছপালা উপড়ে ফেলে বন্ধ করে দিতে পারে পথঘাট। কিছুক্ষণের অতিভারি বর্ষণ ভাসাতে পারে ঘরবাড়ি। এমনটা আজকাল বার বার ঘটছে। লক্ষ করলে দেখা যায় মেঘমুলুকে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মেঘেদের সর্দারকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'তোমরা এমন মারমুখী হয়ে উঠলে কেন?' প্রবল গর্জন করে সে হয়তো বলবে, 'তোমরাই আমাদের ভয়ঙ্কর করেছ'।

বিজ্ঞানীরাও তো তাই বলছেন। আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন থেকে থেকেই মেঘেদের অস্বাভাবিক আচরণের প্রধান কারণ হল মানুষের সৃষ্ট দূষণ। দূষণ স্থলেজলে সব প্রাণীর জীবনে যেমন বিপত্তি ডেকে আনছে, তেমনই মেঘেদের জগতেও ঘটাচ্ছে বিপর্যয়। আর তাই কোমর বেঁধে বারবার পাল্টা আঘাত হানতে উদ্যত হচ্ছে বিপন্ন মেঘের দল। এখনকার বাতাস দূষণে ভারী। নানা পদার্থের অনুকণা বিপুল পরিমাণে মিশছে হাওয়ায়। সেগুলি আসছে কারখানার ধোঁয়া থেকে, পৃথিবীজুড়ে বাড়তে থাকা গাড়ি থেকে, যন্ত্রনির্ভর কৃষিকাজ ও বিশ্বব্যাপী নির্মান শিল্প থেকে। বলা হচ্ছে সেগুলিই বদলে দিচ্ছে মেঘের প্রকৃতি।

কিন্তু মেঘ কি ভাবে সৃষ্টি হয়? বাতাসের বাষ্প এক একটি ধূলিকণাকে ঘিরে তৈরি করে জলবিন্দু, আর তেমনই অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু সব কাছাকাছি এসে ঘনিভূত হয়ে সৃষ্টি করে মেঘ। বাতাসে ধূলিকণা সব কালেই ছিল। সেগুলি ঘিরেই আকাশে জলবিন্দু সৃষ্টি হয়েছে চিরকাল। জলের সেই বিন্দুগুলি এতই ছোট আর ওজনে এতই হাল্কা যে মাটিতে না পড়ে বাতাসে মেঘ হয়ে ভেসে থাকে। সেগুলি যে কত ছোট তা অনুমান করা যায় এই হিসেব থেকে যে এক ঘনমিটার বাতাসে প্রায় ১০ কোটি জলকণা থাকে সাধারণত। সেগুলি যখন একে অপরের সঙ্গে মিশে আকৃতিতে আরও বড় হয় আর ওজনে হয় ভারী, তখনই সেগুলি বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে পড়তে থাকে মাটিতে। এমনটা আগেও হত, এখনও হয়। তবে তফাৎ একটা হয়েছে অবশ্যই। 'ডাউন টু আর্থ'-এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে বাতাসে এখন ধূলি অনুকণার পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেমে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল রোজেনফেল্ড বলেছেন, ধূলিকণা বা 'এয়ারোসোল'-এর পরিমাণ যত বেশি হবে, আকাশে জলবিন্দুর পরিমাণও তত বাড়বে। তিনি বলেছেন যে এর ফলে বেশি বৃষ্টি হবে তেমন নয়। কারণ, আকাশে সঞ্চিত বাষ্প যদি অনেক বেশি এয়ারোসোলে ভাগ হয়ে আরও বেশি জলবিন্দু তৈরি করে, তাহলে সেগুলির আকৃতি ও ওজন হবে আরও কম। ফলে বৃষ্টির ভারী ফোঁটা হয়ে নেমে আসতে পারবে না সহজে। সেগুলি জমতেই থাকবে আকাশে, আর জমতে জমতে এক সময় দৈত্যের আকার ধারণ করে হঠাৎ হুড়মুড় করে সবসুদ্ধ কিছুক্ষণের প্রবল বর্ষণ হয়ে নেমে আসবে মাটিতে। দু মাসের ঝিরঝিরে বৃষ্টি দু দিনেই জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ে ভাসাবে সব দিক। তাঁর মতে, বায়ু দূষণ স্বাভাবিক বর্ষণ ব্যাহত করে অকালে অতিবর্ষণ ঘটাচ্ছে পৃথিবীর নানা দিকে।

আকাশে বাতাসে মেঘমুলুকে

প্রায় একই কথা বলেছেন আরও দুই বিজ্ঞানী – দিল্লির আবহাওয়া দপ্তরের এম মহাপাত্র আর মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ইউনিভারসিটির গবেষক সুদীপ চক্রবর্তী।

'ডাউন টু আর্থ'-এর প্রতিবেদন বলছে, ভারতের মানচিত্রের ওপর চোখ বোলালে দেখা যায় যে, যেসব অঞ্চলে কলকারখানা বেশি – যেমন গঙ্গার প্রবাহপথ ধরে উত্তর থেকে পূর্ব ভারত, মধ্য ভারত, আর দক্ষিণের ডেকান উপত্যকা – সে সব স্থানেই মেঘেদের গতিপ্রকৃতিতে বদল লক্ষ করা যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে বর্ষার আসা যাওয়ায়ও।

ছোট হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবন

সুন্দরবন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ও ভারতে - দুই দেশের সুন্দরবনেই ভূখন্ড কমছে আর জলাভূমি বাড়ছে। সেই সঙ্গে সুন্দরবনে সুন্দরীসহ সব ধরনের গাছের সংখ্যাও কমছে। বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জলসম্পদ মন্ত্রকের গবেষণায় দেখা গেছে গত ২৪০ বছরে সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার কমেছে। জানা গেছে গত ২৭ বছরে ভারতের সুন্দরবনের আয়তনও ৬২ বর্গকিলোমিটার কমেছে এবং জলাভূমির আয়তন ৫৮ বর্গকিলোমিটার বেড়েছে। সেই সঙ্গে গাছও কমেছে। এ বিষয়ে ভারতের নদী বিশেষজ্ঞ কল্যান রুদ্র বলেছেন, সুন্দরবনের মানচিত্র বদল নিয়ে তাঁর গবেষণাতেও আয়তন কমে যাওয়ার ছবি ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে সুন্দরবনের যেসব অংশে মানুষের বসতি বেশি ও গাছ কম, সেখানে বেশি ভাঙন হচ্ছে বলে তিনি জানান।

cwi lev

সাপের চার পা

এক সময় সাপেরও পা ছিল। এখন আর নেই। বিবর্তনের ফলে তারা কোনও এক সময় তাদের পাগুলি খোয়ায়। সেই থেকে তারা তাদের বুকের ওপর ভর দিয়ে পা ছাড়াই চলে বেড়ায়। তবে প্রকৃতির প্রয়োজনে তাদের পা আবার গজাতে পারে। তেমন ব্যবস্থাও করা আছে। কারণ শরীরে যে জিন পা সৃষ্টি করে সেটি এখনও তাদেও শরীরে আছে। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন সেটি 'অফ' বা নিভে আছে। 'অন' হলেই সাপের আবার চারটে ঠ্যাং বেরবে। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ফ্লরিডা ইউনিভারসিটির জীববিজ্ঞানী মার্টিন জে. কহ্ন বলেছেন যে পাইথন, বা যাদের আমরা সাধারণভাবে অজগর বলি, তাদের শরীরে ওই জিন কখনও কখনও 'অন' হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় তাদের গায়ে নখের মত বস্তু বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়। তাহলে কি পাইথন আবার তাদের পা ফিরে পাবে? সেটা অসম্ভব নয়, যদি সেই ঘুমন্ত জিনটিকে আবার সক্রিয় করে তোলা যায়।

আফ্রিকার বুনো গাধা আর মাত্র ৫৭০

মানুষ তার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল বহু যুগ, তা প্রায় ৬০০০ বছর আগে। আফ্রিকার অরণ্য থেকে ধরে এনে পায়ে শেকল পরিয়ে তাকে ঘরের আঙিনায় টেনে আনা হয়েছিল। তারপর ক্রমশ সে পোষ মেনে মোট বওয়া গৃহপালিত গাধায় রূপান্তরিত হয়। মনে করা হয় আফ্রিকান ওয়াইল্ড অ্যাস বা বুনো গাধাই, আজকের মোট বওয়া গাধাদেরই পূর্বপুরুষ। এখনও পূর্ব আফ্রিকায় পাহাড়ি মরুভূমি অঞ্চল, যেখানে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট ছাড়িয়ে যায়, সেখানে তাদের কদাচিৎ দেখা মেলে।

প্রায় অবলুপ্তির দরজায় পৌঁছে যাওয়া এই আফ্রিকার বুনো গাধারা চরম বিপন্ন'র তালিকাভূক্ত হয়ে গেছে। কারণ ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া'র বন্য পরিবেশে এখন সংখ্যায় তারা রয়েছে আর মাত্র ৫৭০। একদা আফ্রিকার উত্তর ও পশ্চিমে সুদান, ইজিপ্ট, লিবিয়াতেও তাদের দেখা যেত। মরুভূমির বাসিন্দা উটের মতোই কষ্টসহিষ্ণু এই গাধারা তিন দিন পর্যন্ত জল না খেয়েও বাঁচতে পারে। তার খাদ্য বলতে মরুভূমি, আধা-মরুভূমি অঞ্চলের ঘাস-পাতা-কাঁটাঝোপ। তাদের বড় বড় লম্বা কান যেমন তাদের শ্রবণ-শক্তিকে প্রখর করেছে। তেমনি ওই লম্ব-কর্ণদ্বয় তাদের শরীররকে ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে বেশ। লতায় পাতায় ঘোড়া প্রজাতিরই জ্ঞাতি এই বুনো গাধারা উচ্চতায় সাড়ে ৬ ফুট থেকে সাড়ে ৭ ফুট হয়। জেব্রার মতো তাদের পায়ে ডোরা কাটা। ধূসর ও হাল্কা ঘিয়ে রঙের এই গাধার ওজন হয় ২৩০-২৭০ কেজি মতো।

বিপন্ন যারা

তাদের গলরা স্বর খুব জোরালো, ডাকলে ৩ কিমি দূর থেকেও সেই আওয়াজ শোনা যায়। তাদের ওই উচ্চ স্বরে ডাকই মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় তাদের সাহায্য করে। শক্ত সমর্থ এই প্রাণীটি ঘোড়ার মতোই জোরে দৌড়তে পারে। প্রায় বছর ৪০ বাঁচতে পারে তারা।

মরুভূমির বাসিন্দা উটের মতোই কষ্টসহিষ্ণু এই গাধারা তিন দিন পর্যন্ত জল না খেয়েও বাঁচতে পারে

অবৈধ হলেও এই ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া দু'জায়গাতেই এই আফ্রিকান বুনো গাধা শিকার করা হয় খাওয়ার জন্য এবং সনাতনি ওষুধ ব্যবহারের জন্য। তাই তাদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন মাত্র কয়েক'শতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দেওয়াল লিখন

পৃথিবীর ২০ দূষিততম শহরগুলির মধ্যে ১৩ ভারতে অবস্থিত

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

RNI Regn No. WBBEN/2000/01531 Date of Publication: November 1, 2016 Postal Regn No.KOL RMS/262/2016-18

অবাক পৃথিবী

● আলাস্কায় ১৯৮৯ এ সমুদ্রে তেল চুইয়ে যে দূষণ ঘটেছিল তাতে উপকূলের প্রায় ১,১৮০ মাইল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর সেই দূষণে এক লক্ষ সাগরপাখির মৃত্যু হয়েছিল।

● শামুকদের একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলে তাদের আবার একটা নতুন চোখ গজিয়ে যায়।

● পৃথিবীর ৭০% সাগর তথা জলে ঢাকা। কিন্তু সেই সাগরের মাত্র ৫%ই আবিষ্কার করতে পেরেছে মানুষ। বাকি ৯৫%ই রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত।

● পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত প্রাণ হচ্ছে একটি মাশরুম। ওরেগাঁওয়ের মাটির নীচে থাকা ওই মাশরুমের ব্যাসের আয়তন সাড়ে ৩ মাইল।

ওপরে বরফ, নীচে আগুন

দেশটার নাম আইসল্যান্ড বা বরফের দেশ। পৃথিবীর উত্তরে হিম শীতল আবহাওয়ার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল তার অগ্নিগর্ভ ভূগর্ভ। আইসল্যান্ডে রয়েছে ইয়াফাল্লাইয়োকুল-এম'র মত বেশ কয়েকটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি এবং গরম জলের কুন্ড। এমনটা হওয়ার এক বিশেষ ভৌগলিক কারণ আছে। এই দেশটির তলায়, আটলান্টিক মহাসাগরে মিশেছে আমেরিকার ভূখন্ড বা 'প্লেট' ও ইউরেশিয়ান ভূখন্ড। এই দুই ভূখন্ডের ঘনঘন আন্দোলনের ফলে আইসল্যান্ডের ভূত্বকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, যা দিয়ে পৃথিবীর গভীর থেকে উঠে আসে তপ্ত জল, বাষ্প আর ম্যাগমা বা গলা পাথর। আইসল্যান্ডের তলায় কোলবেনসি শৈলশিরাতেও তৈরি হয়েছে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ। এভাবে সেখানকার ভাটনাইয়োকুল হিমবাহের প্রায় ৬০০ ফিট গভীরেও একটি ফাটল দিয়ে যেন সরোষে

লাফিয়ে উঠছে লাভা ও গন্ধকের উতপ্ত বাষ্প মেশান একটি গরম জলের প্রস্রবণ। হিমবাহের ওপর ওই প্রস্রবণ থেকে ফোয়ারার মতো য়আসে ম্যাগমা, বাষ্প ও ছাই। আর তারই প্রভাবে জমে থাকা বরফস্তরের ওপর তৈরি হয়েছে একটি ৫০০ ফিট খাদ বা 'ক্যানিয়ন'। খাদটি প্রায় মাইল দুয়েক লম্বা। হিমবাহটির বরফ গলা জল জমা হচ্ছে একটি বড় মাপের গহ্বরের মধ্যে। ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন ওই হিমবাহের বরফ যদি এই ভাবে গলতে থাকে তাহলে এক ভয়াবহ বন্যার মুখে পড়তে পারে আইসল্যান্ড।

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)

c w_exi Wv qwi cvIqv hvq

ক্যুইজ?!?!

1 | চিনের প্রথম উপগ্রহ দঙফ্যাঙহঙ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ২৪ এপ্রিল ১৯৭০ এ। সেটির নামের মানে কি?
(ক) পূর্বদিক লাল (খ) চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ (গ) ভবিষ্যৎ আমাদের (ঘ) বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

2 | কোন জায়গার কথা বলছি?
(ক) চেন্নাই থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে (খ) এখানে সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র আছে (গ) এখানে যা হয় তার অনুরূপ কাজ হয় তিরুবনন্তপুরমে'র কাছে থুম্বা'তে (ঘ) পুলিকট হ্রদ আর বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে

3 | পৃথিবীর সব থেকে উঁচু রেল স্টেশন কোনটি?
(ক) দার্জিলিঙের কাছে ঘুম (খ) তিব্বতের তাঙ্গুলা (গ) পেরুর টিকলিও (ঘ) বলিভিয়ার কন্ডোর

4 | চারটি দেশ ও তাদের বর্তমান বা অতীতের রাজবংশের নাম দিলাম। মেলাতে হবে।
রাশিয়া, সিকিম, ব্রিটেন, ভূটান
(ক) রোমানভ (খ) ইউন্ডসর (গ) নামগিয়েল (ঘ) ওয়াঙচুক

5 | কোথায় সব থেকে বেশি মাংস খাওয়া হয়?
(ক) রাশিয়া (খ) আমেরিকা (গ) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ঘ) চিন

6 | যে কোনও বিভাগে সব থেকে কম বয়সে নোবেল প্রাইজ কে পেয়েছেন?
(ক) মেরি কুরি (খ) মারকনি (গ) মালালা ইউসুফজাই (ঘ) মার্টিন লুথার কিং

7 | পৃথিবীর কোন দেশে কৃষিজ উৎপাদন সবথেকে বেশি?
(ক) ব্রেজিল (খ) ভারত (গ) দক্ষিণ আফ্রিকা (ঘ) চিন

8 | এশিয়ার দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট গন্ডার সম্বন্ধে কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) কেবল সুমাত্রাতে পাওয়া যায় (খ) এক সময় ভারতেও দেখা যেত (গ) যে ৫ রকম গন্ডার আছে তাদের মধ্যে সবথেকে ছোট (ঘ) এখন এদের সংখ্যা ৮০ র কাছাকাছি

9 | এদের কোথায় পাওয়া যায়?
(ক) হিপোক্যাম্পাস (খ) হিপোথ্যালামাস (গ) থ্যালামাস (ঘ) অ্যামিগডেল

10 | কোনটির ফুল থেকে ফল হতে মৌমাছির সাহায্য লাগে না?
(ক) পেয়ারা (খ) ধান (গ) গম (ঘ) আপেল

উত্তর: ১/ক; ২/ শ্রীহরিকোটা উপগ্রহ উৎক্ষেপনকেন্দ্র; ৩/খ; সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০৬৮ মিটার উঁচু; ৪/রাশিয়া ক, সিকিম গ, ব্রিটেন খ, ভূটান ঘ; ৫/ঘ; ৬/গ; ৭/ঘ; ৮/ক বোর্নিওতেও দেখা যায়; ৯/মগজে; ১০/ক আর গ, এদের পরাগ সংশ্লেষ হাওয়ার সাহায্যে হয়।

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com